Waiting For The Bough To Break:
On the Paintings of Matthew Krishanu

Bidisha Mamata

Bengali Translation by Matthew Krishanu's mother

‘বৃক্ষ-শাখাটা ভেঙ্গে যাবার অপেক্ষা: ম্যাথু কৃশানুর চিত্রাঙ্কন’
লিখেছেন সাংবাদিক বিদিশা মমতা, অনুবাদ করেছেন ম্যাথু কৃশানুর মা

ম্যাথু কৃশানুর চিত্রাঙ্কন চোখকে শান্ত করে, আর আত্মায় আলোড়ন ঘটায়। আসবাস-হীন খ্রীষ্টান গীর্জার সুবৃহৎ কক্ষে, দক্ষিণ এশিয়ার এক গ্রাম্য দৃশ্যের চিত্রে, এক শ্বেতকায় পুরুষ সংকুচিত-ভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করছেন এক মঞ্চে – উপস্থিত বাঙ্গালী ভক্তরা তার দিকে উন্নত মস্তকে তাকিয়ে – হতভম্ব অবস্থায় নাকি? এই পুরুষের ছেলেরা, দুজন গঠিত সমিতির মত ,তারা পালায় আশে পাশের গ্রাম্য পরিবেশে ,উত্তাপে ফেকাসে বিস্তৃত ভূমিখন্ড অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে। এই ছেলেরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত , কিন্তু শিষ্ট। তারা শিকারি না, যোদ্ধা না , সৈনিকের অগ্রদূতও না। তারা খেলার মাঠে শিশুর মত বিস্তৃত ভূমিখন্ডের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। এটা ১৯৮০ শতক, ১৮৮০ না। কয়েক সংখ্যক চিত্রে ছেলেরা বয়সে বাড়ে, কিন্তু কখনই নবযৌবনের বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায় না।
প্রথমে মনে হয়, ম্যাথু কৃশানুর প্রদর্শনী দর্শকদের উপমহাদেশে একটি প্রশান্ত ছুটি কাটানোর চিত্র উপহার দিচ্ছে। এর মধ্যে আছে একটি আধ্যাত্মিক বিশ্রাম স্থান – কাল্পনিক জঞ্জাল-মুক্ত অতল নীল জলরাশি – সীমাহীন সূর্যের আলোতে ফেকাসে আকাশ – উত্তপ্ত শক্ত মাটি – কোমল বিজ্ঞ বৃক্ষরাশি – শ্যামল সবুজ ঝোপঝাড় এবং মসৃণ হলুদ হয়ে যাওয়া ভূমি। এটা চোখের ভুল। এই শিল্পকলার একটা সংকুচিত কমনীয়তা আছে, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে একটা অস্বস্তির স্পন্দন লক্ষণীয়। কৃশানুর মা (ভারতীয়, ধর্মতত্ত্ববিদ, বিদ্যানুরাগী) বাবা (শ্বেতাঙ্গ, ইংরাজ, পাদ্রী) এবং তাদের দুই অল্পবয়সী ছেলে নিয়ে এই পরিবারের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে, পাশ্চাত্য উপনিবেশ-স্থাপন, পুরুষ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থা এবং মিশনারি প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে কৃশানুর সমালোচনা-মূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রবাহমান। এগুলি পারিবারিক ফোট, কিন্তু এসবের মধ্যে কিছু তীব্রস্বাদ লক্ষণীয়, আধ্যাত্মিক প্রচার সম্পর্কে সন্দেহ, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আর পারিবারিক আবদ্ধতা সম্পর্কে আশংকা, একদেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা, পিতৃতন্ত্র সম্পর্কে প্রশ্ন। ছবিগুলি দেখে মনে হয়, ছেলেরা সতর্কভাবে অপেক্ষা করে আছে – অন্য জুতোটা কি পড়ে যাবে? বৃক্ষ-শাখাটি কি ভেঙ্গে যাবে?
কর্মজীবনব্যাপি, ধারাবাহিক ভাবে সংগঠিত, কৃশানুর চিত্রাঙ্কন চিত্রিত করছে তার চিন্তাধারা এবং স্মৃতিচারণ, যার কোন শেষ নেই। ‘আর একটা দেশ’, ‘দুই ছেলে’, ‘পবিত্র পরিবার’, ‘মিশন’ – ধারাবাহিক ভাবে উপস্থিত ছবিগুলির নাম পরস্পরের প্রতিধ্বনি এবং পরস্পরের উপর স্থাপিত। এই ছবিগুলি যে কোন বিভাগেরই অংশ হতে পারত। যদিও গঠনে ও মাপে, কৃশানু অনেক নমনীয় ব্যতিক্রমের অবকাশ দেন, বর্ণে, রং মিশ্রণ রুক্ষ কি চকচকে হবে এই বিষয়ে, বিষয়বস্তুতে এবং ভাববস্তুতে তিনি দৃঢ় অটলতা বজায় রাখেন। এসব তিনি করেন পারিপার্শ্বিক প্রভাবের চাপ পরিমাপের দন্ড শক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। ভাবটা স্থির মনে হলেও, কখনই প্রশান্ত না। চিত্রিত শরীরগুলি কেবল নিদ্রিত অবস্থাতেই অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়।

আক্ষরিকভাবে এবং ভাবাবেগে ছবিগুলি বিরূপভাব প্রদর্শন করে। বেশিরভাগ জনতার দৃশ্যে দেহগুলি পিছন ঘোরা, মুখ ফেরানো, নত দৃষ্টি। প্রতিটি দৃশ্যে, 'কাহিনীকার' দৃশ্যতঃ অদৃশ্য, জনতার পিছনে। চার্চের দৃশ্যে, যারা মঞ্চে, তাদের আঁকা হয়েছে নির্লিপ্ত ভাবে, যেন তারা সখের অভিনেতা, যীশুর জন্মবিবরণের নাটকতা করতে গিয়ে, অভিনয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। 'প্রভুর ভোজ' (২০১৭) ছবিতে, যাজকত্বে রত পাদ্রী বহুদূরে – যেন দূরত্ববজায় রাখা বাবা – চিত্রকর যেন জনতার একজন, যার সামনে অনেক মানুষের মাথার পিছন দিক – সবাই যেন ভয় আর শ্রদ্ধায় হাঁ করে তাকিয়ে আছে।
ছেলেটি আর তার ভাই প্রায় পালায় বিস্তৃত ভূখন্ডে ঘুরে বেড়াতে। প্রকৃতি সব সময় সহায়তা করে না, বা লোকানোর স্থান যোগায় না। কিন্তু ভুমি এত বিস্তৃত যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, বিশৃঙ্খলা এবং আবর্জনার অভাব দেখে মনে হয়, কৃশানুর উন্মুক্ত স্থানের দৃশ্যগুলি হয়তো তাঁকে কোন অশুভ অতীতকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, নয়তো এটা একটা নিখুঁত স্বপ্নের ছবি।
কখনও কখনও, বাস্তব প্রকৃতি যেন আপন মহিমায় ঠেলেঠুলে ঢুকে পড়ে ছবিতে – সবচেয়ে বেশী লক্ষিত হয় 'বটগাছ, ছেলে' (২০২৩) ছবির তীব্রভাবে আঁকা মোটা বাদামি তরুশাখাগুলিতে। কৃশানু মহা আড়ম্বরে উপস্থাপন করেছেন এশিয়ার প্রতীক-বহনকারী বটগাছ। বিশাল ফোঁটা ফোঁটা ভাবে পড়া, আবর্তিত কৃতজ্ঞতা বোধ দিয়ে অঙ্কিত গাছ যেন ছেলেদের প্রচন্ড উত্তেজনাপূর্ণ আবেগগুলি বহন করতে পারে, যা ছেলেরা পারে না। গাছটি যেন চিৎকার করে প্রকাশিত করছে তার দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল অকৃত্রিমতা, দিকে দিকে যার অভাব স্পষ্ট। ছেলেটি গাছের বড় ডালটায় নির্ভয়ে বসে আছে, যেন গাছের শিরা উপশিরা, শাখা প্রশাখার সহৃদয় আলিঙ্গনে সে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গিত।
আসল Transubstantiation, রূপান্তর (রোমান ক্যাথলিক মতে, প্রভুর ভোজের সময় রুটি ও দ্রাক্ষারস যীশুর দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয়) চার্চে ঘটে না, ঘটে প্রকৃতিতে, যেখানে উত্তাপে আকাশ ঘন, সূর্যের আলোতে ফেকাসে সাদা হয়ে যাওয়া পাথর। কৃশানু প্রায়ই জলের ছবি আঁকেন, জল যেন তার সান্ত্বনা দাতা বন্ধু। বট গাছের চিত্রে এবং অন্যত্রে, ছেলেটি সবচেয়ে বেশি খুশি আর দৃঢ়চেতা যখন সে পারিপার্শ্বিক অন্য সব কিছুর তুলনায় ক্ষুদ্রতম। 'ছেলেটি সাঁতার কাটছে' (২০২৩) ছবিতে, ছেলেটি কেবল একটি দ্রুত অংকিত কালো চুলের রাশ, এক আঁচড়ে আঁকা কাঁধ, সে যেন নীলকান্তমণি জলরাশিতে ডুবে যাচ্ছে, যে জল তার সামনে গাঢ় রেশমের মত রাশীকৃত। একই ধরণের নামের ছবি 'জলাশয়, সাঁতারু ছেলে' (২০২৪) উপস্থাপন করছে সীমাহীন নীল জলাধার, গভীরতায় যা অতল, অন্ধকার, কেবল অগভীর স্থান আলোকিত। তারই মাঝে একটি ছেলের ছোট্ট আকার, ব্যাঙের মত।
সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য স্বস্তি আসে তখনই, যখন ছেলেটির প্রতিচ্ছবির মত, দুজন গঠিত সমিতির অন্য ভাই, উপস্থিত থাকে। 'শোবার ঘর, যীশুর শেষ নৈশভোজ' (২০২১) ছবিতে দুই ছেলের উজ্জ্বল রক্তিম রাঙ্গা বিছানার চাদর যেন তাদের জড়িয়ে ধরে রেখেছে। তারা যেন যমজ শিশু মাতৃগর্ভে, নীড়ের পক্ষিশাবকের মত পাশাপাশি শুয়ে আছে। পরস্পরের প্রতিচ্ছবির মত ছেলেরা আবার উদয় হয় 'সোফা, দুই ছেলে, কর্নয়াল' (২০২৩) ছবিতে। গরম মোটা জামা, দস্তানা, ও গলাবন্ধে সুরক্ষিত ভাবে জড়ানো দুজনে সোফার দুই প্রান্তে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাদের সচারচর দৃশ্যতঃ, সন্দিগ্ধ জড়তা অদৃশ্য। কেবল সেই সময়ই তারা জড়তামুক্ত, যখন আক্ষরিক ভাবে তারা রক্ষাকবচের মত কাপড় চোপড়ে জড়ানো দুই শিশুর মত, একসাথে ঘুমন্ত।
যখন জাগে, তখন দুজনে সমভাবে ভাবগম্ভীর, কাজল কালো চোখ, রোগা পাতলা গঠন, সব সময় পরস্পরের পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ – যেমন দেখা যায় 'কঙ্কাল' ছবিতে – যেখানে যুগলে ফেকাসে সবুজ মাঠে দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে গরুর সাদা হাড় কঙ্কাল। এই স্বস্তি-বিহীন,

নন্দনকানন-বিহীন 'লর্ড অফ দা ফ্লাইস' উপন্যাসে বর্ণিত স্থানের মত এক জায়গায়, ছেলেদের চোখগুলো কি এক আমেজে চকচক করছে। 'ঘোড়ার পিঠে দুই ছেলে' (২০২৪) ছবিতে মনে হচ্ছে দুজন খুশি মনে, ঘোড়ায় চড়ে চিরকালের জন্য পালিয়ে যেতে পারে। 'নৌকায় দুই ছেলে' (২০১৭) চিত্রে দুই ছেলের একতা একটু বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। কাঠের নৌকার অন্যদিকে বসা দর্শকের বিরুদ্ধে তারা দুজনে মিলে যেন ষড়যন্ত্র করছে। দুজনে কাছাকাছি বসে, ঘাড় ঘুরিয়ে, আমরা যারা দর্শক, তাদের দিকে কটাক্ষপাত করছে, তারা চাইছে অনধিকার প্রবেশকারী, আমরা, দর্শকরা, যেন জলাশয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পালাই। সার্বিক ভাবটা এই – আধ্যাত্মিক একটা কিছু স্থগিত আছে – বিচারের রায় যেন এখনই পড়বে – এক সত্তা যেন এখনই তার উপস্থিতি জানাবে। এই বোধটি না হয় সমর্থিত, না পায় পরিপূর্ণতা। এই অনুপস্থিত রহস্যময় বিষয়টিই কৃশানুর কাজকে চিত্তাকর্ষক করে তোলে।
কেবল একটি দৃশ্য – এই প্রদর্শনীর সব চিত্রের মধ্যে অনুপম – প্রকাশিত করে সার্বিক তৃপ্তি ,আস্থা আর পরম আনন্দ। এটি 'হোটেল শয্যা, দিল্লী' (২০২৩)। এই ছবিতে চিত্রিত কৃশানুর গত স্ত্রী, লেখিকা উশি গ্যাটওয়ার্ড। গ্যাটওয়ার্ড ঘুমাচ্ছেন, মুখমন্ডল কোমল, শরীর শিথিল, মুক্তকেশী। বিছানার মাথার ফলকটি যেন উত্থিত সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশ। এই চিত্রটি তার মৃদু রেখায় প্রদর্শন করছে সুস্পষ্ট কমনীয়তা, রংএ উদ্দীপ্ত উজ্জ্বলতা। উপলক্ষিত ব্যক্তির মুখাবয়বের উপর চিত্রকরের দৃষ্টি যেন ঘোরাফেরা করছে, রোমশ কোমল তুলির আঁচড় সোহাগপূর্ণ। ভাবছি, এই কোমলতা কি মানব সমাজের বর্ণভেদ এবং লিঙ্গভেদ সম্পর্কে কিছু বলছে? কৃশানুর চিত্রাঙ্কনে শ্বেতকায় পুরোহিত গুলি অতিরিক্ত গম্ভীর, অতিরঞ্জিত পোষাকে সজ্জিত, আড়ম্বরপূর্ণ। ভারতীয় ও বাংলাদেশী পুরোহিতরা সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে অঙ্কিত, বিশেষতঃ লাবণ্যময় 'পুরোহিত ও শিশু' (২০১৬) ছবিটিতে। এখানে যেন ম্যাডোনা ও শিশুর চিত্রটিকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই চিত্রে এক কোমল-আঁখি বাঙ্গালী যুবক পুরোহিত এক ফর্সা নবজাতককে সোহাগের সাথে কোলে জড়িয়ে ধরেছেন।
'চার মঠবাসিনী' (২০২০) চিত্রিত করছে নিখুঁত সাদা, কোমল সুতির শাড়ি পরিহিতা চার নারীকে, যাঁদের কন্ঠহার রজ্জুবদ্ধ অতি সাধারণ ক্রুশ। এনারা পাশাপাশি অবস্থিত, কিন্তু মুখে তাঁদের হাসি নেই। অথচ তাঁদের সোহাগপূর্ন একাত্মতা এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা যেন সকলের অগোচরে, সাম্রাজ্যবাদিদের ধৃষ্টতাপূর্ণ ভাবধারা, যে তারা আদিম বর্বর ধর্মের লোকদের ধর্মান্তরিত করছে, এই উদ্ধত অভিপ্রায়কে মিথ্যা প্রমাণিত করে, একটি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে উদ্‌বুদ্ধ, একত্রিত, জীবন- উৎসর্গিত ভ্রাতা ভগ্নীর পরিবার তৈরী করে ফেলেছে। 'প্রচার' (২০১৮) ছবিটি অন্যান্য চিত্রে উপস্থাপিত, পুরুষ-শাসিত সমাজের ভন্ডামিকে তিরস্কার করে, পুরুষ এবং শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিগুলিকে চিত্রের কিনারায় ঠেলে দিয়ে, কৃশানুর মাকে একজন ধর্মতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপস্থাপনা করেছে। তুলনা মূলক ভাবে বলতে গেলে, পাশ্চাত্য ধ্যানধারণায় প্রভাবিত পুরুষ-শাসিত ধর্মীয় ব্যবস্থায়, একজন শ্যামবর্ণা নারীর উপাসনা পরিচালনায় নেতৃত্ব সমাজ-সংস্কারী। অন্য সব দিক থেকে দেখতে গেলে, স্পষ্টতঃ রাফায়েলের পূর্বে শিল্প জগতে প্রচলিত ধারা অনুসারে, এই নারীকে একজন ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে – হয়ত একজন পন্ডিতা হিসাবে – জ্ঞান গম্ভীর সৌন্দর্যে উপস্থাপিতা – চমৎকার বস্ত্র পরিহিতা – যার সহচারিণীরা তাঁদের দীপাধারের মাধ্যমে, দর্শকদের তাঁরই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন। আমার কোন সন্দেহ নেই, যে এটা কৃশানুর মাকে শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও, পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান চিত্র শিল্পের ইতিহাসকে পরিহাস করা। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে, স্পষ্ট ব্যাখ্যা দুরূহ এবং অনিশ্চিত রাখাটাই কৃশানু পছন্দ করেন। মিশন শ্রেণীভুক্ত চার্চ সম্পর্কিত চিত্রগুলি বিশাল, চলচ্চিত্রের রূপে রচিত, সবকিছু ছাপিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। প্রধান চরিত্র গুলিকে আলোকিত করে প্রাধান্য দিয়ে যেন চিত্রকর ছায়ায় লুকিয়ে হেঁয়ালিটা পর্যবেক্ষণ করছেন। দৃশ্যগুলি রহস্যময়, বিদ্রূপে স্পন্দিত। অন্যান্য চিত্রগুলি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বাইরেটা রোদের তাপে উত্তপ্ত – এত

গরম যে ছেলেরা হাফপ্যান্ট আর হাতকাটা জামা পড়া – অথচ ভিতরে বিশপ পাদ্রীরা পোষাক পরিচ্ছদ দ্বারা সর্বাঙ্গে আবৃত।
পাদ্রী পুরোহিতরা যতই চেষ্টা করেন না কেন, চার্চের দৃশ্যগুলিতে যেন ঈশ্বর অনুপস্থিত। কৃশানুর মাঝারি আকারের চিত্রগুলিতে যা অবশিষ্ট আছে, তা কেবল কয়েকটি চটকদার আনুসঙ্গিক উপকরণ – নিরলঙ্কার দেওয়ালে হঠাৎ নজরে পড়ে সরু, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি – একযোড়া পেতলের মোমবাতিদান – এক বিশাল চিত্রে একটি এক পা বিশিষ্ট সরু পুলপিট, যেন ছাত্রছাত্রীদের বিতর্ক সভার লেকটান।
কোন ছবি বড়, মাঝারি বা ছোট হবে, তা নিয়ে যেন কৃশানু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। মাঝারি চিত্রগুলি সুবিবেচিত, বাস্তবধর্মী, সৌন্দর্য-মন্ডিত পরখ। রংএর চাকচিক্য, তরলতা, আড়ম্বর উপভোগ্য। প্রায়ই সাধারণ একটি দেওয়াল, বা একরঙ্গা কোন আকৃতি দৃষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট করে, যেমন, ‘পবিত্রস্থান, মোমবাতি, খ্রীষ্ট’ (২০২২) চিত্রটিতে। এখানে চিত্রিত হয়েছে বিশাল নিবিড় কালো গুহার উদর, যা কাঠামোর চারভাগের তিনভাগ দখল করে আছে। তার সামনে সরু পাথরের উপর সরু একসারি মোমবাতি। আর গুহার উপর, প্রায় দৃষ্টির অগোচরে, এক ধর্মীয় প্রতিমূর্তি। যেন আধ্যাত্মিকতার অন্বেষণকারী ব্যক্তির চেয়েও, অধিক ক্ষুধার্ত গুহা-চিত্রটিকে উদরস্ত করছে। গুহার মুখের তুলনায় মোমবাতি এবং ধর্মীয় প্রতিমূর্তি অকিঞ্চিতকর মনে হচ্ছে। ‘লাল গীর্জা, সবুজ মাঠ’ (২০২৪) ‘গীর্জার গম্বুজ আর মাঠ’ ((২০২৪) চিত্রগুলিতে গিরিমাটি-রঞ্জিত জ্ঞান গম্ভীর কোমলতায়, প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। মানুষ রচিত গীর্জা না, তা কেবল একফালি স্থানে সীমাবদ্ধ। ইঁট পাথরের গৃহের চিত্রগুলি যেন খসড়া, ওদিকে উত্তাপে নির্মল খোলা মাঠ, জীবন ও অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্ভাবনায় ঝিকমিক করছে। স্পষ্টতঃ, এখানে কৃশানু সমাজ সংস্কারকের ভূমিকায়, সমাজ স্বীকৃত প্রভুত্বের প্রতীক গুলিকে ক্ষুদ্র আকার দিয়ে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে বহির্ভাগে ঠেলে দিচ্ছেন। তাছাড়াও এটি একটি ফোটগ্রাফি পদ্ধতিকে নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষা। দেখানো হচ্ছে বিকল্প, বিকেন্দ্রিক, অসমভার কৌশলের একদম বিপরীত ফলাফল। দর্শকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে তারকা মন্ডিত বিষয়বস্তু, সোনালি অনুপাত, প্রচলিত রীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিপথ, গতানুগতিক ভাবে চিহ্নিত প্রধান ব্যক্তি অপেক্ষা, চিত্রের বিশাল অগ্রভূমি, পটভূমি, আপাতঃ দৃষ্টিতে শূন্যস্থান বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। তাছাড়াও, যখন তিনি রং প্রয়োগ করেন, রংএর তরলতা, ফোঁটা ফোঁটা করে রং পড়ার মাধুর্য, এসবও তিনি উপভোগ করেন। তিনি রং মেশানোর ফলককেই প্রদর্শন করছেন। অয়েল পেন্টিংই হোক, কিংবা অ্যাক্রিলিক পেন্টিংই হোক, তাঁর মার্জিত রং মনোয়নের জন্য, মনে হয় তিনি উদ্ভিজ্জ রং ব্যবহার করছেন। অঢেল সৃজন ক্ষমতাবান, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত, উচ্চাকাঙ্ক্ষি এবং আত্ম-সচেতন, নতুনের সন্ধানী, কিন্তু যা তাঁর সৃজনকে প্রভাবিত করেছে, সে সম্পর্কে অকপট, ম্যাথু কৃশানু। বৈচিত্র্য, আত্মবিশ্বাস, এবং লক্ষ্যে পৌঁছেছে এই ভাবধারা নিয়ে তার যে প্রদর্শনী, তা এই বসন্তকালে শুরু হয়েছে ক্যামডন আর্ট সেন্টারে। সন্দেহ নেই যে তার গঠনমূলক অভিজ্ঞতার কারণে বাহ্য লৌকিকতার আড়ম্বর, অতিরঞ্জিত উচ্ছ্বাস তিনি পছন্দ করবেন না। সেইজন্য লক্ষ্য করুন দুইটি ছেলেকে, যারা উঁকি মারছে, খেলে বেড়াচ্ছে, ছোট্ট দুটি মানুষ, যাদের মুখের ভাব দ্ব্যর্থক, অসীম আকাশ আর বিস্তৃত জলরাশির মাঝে বৃক্ষশাখায় অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। হয়ত তারা পড়ে যাবে, নয়ত বন্ধনমুক্ত ভাবে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে।